জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১১, সংখ্যা-১, জানুয়ারি-জুন ২০২১

সাম্প্রতিককালে লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা

সিতুল মুনা হাসান*

Abstract

This article verifies every characteristics of Lenin's theory of imperialism to prove its effectiveness in recent days. By analysing contemporary datas his theory becomes more relevant in circumference of time and all of its criterions confirm more reliability in present days. This analytic article tries to evaluate the future predictive power of the theory of imperialism by giving example of the role of monopoly capital of today's oil and media industry, development of banking sector, relation between developed and third world nations, present scenarios of political and economic dominance.

মার্কস পুঁজিবাদের গতি ও বিকাশের নিয়ম আবিষ্কার করেছেন। পুঁজিবাদ বিশ্লেষণের মার্কসীয় ধারণার উপর ভিত্তি করে লেনিন প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ক তত্ত্ব। *সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়*[১] গ্রন্থে তিনি এ মতবাদকে সূত্রবদ্ধ করেন। লেনিন বলেন, পুঁজিবাদের বিকাশের সেই পর্যায়কে সাম্রাজ্যবাদ বলা হয় যে পর্যায়ে একচেটিয়া কারবার ও মহাজনী পুঁজি প্রাধান্য লাভ করে।[২] শিল্প ও ব্যাংকে কীভাবে একচেটিয়ার উদ্ভব হয়েছে সে সম্পর্কে তিনি তাঁর গ্রন্থে ব্যাপক তথ্য প্রদান করেছেন। তিনি আরও দেখান, শিল্প ও ব্যাংকের সংমিশ্রণে যে ফিন্যান্স পুঁজির জন্ম তা কিভাবে গোটা অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। অধিকতর মুনাফার স্বার্থে এই ফিন্যান্স চলে যায় অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত দেশে। ফিন্যান্স পুঁজি ও তাকে ঘিরে যে ফিন্যান্সিয়াল অলিগার্কি[৩] তৈরি হয় তারাই এ যুগের শাসক ও শোষক শ্রেণি এবং তাদের স্বার্থে বিভিন্ন রাষ্ট্রের নীতি তৈরি হয়। মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী, হবসনের *Imperialism*[৪] (১৯০২) ও হিলফর্ডিং-এর *Finance Capital*[৫] গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর সময়কার রাজনৈতিক-অর্থনীতি পর্যালোচনা করে লেনিন তাঁর (১৯১৬ সালে রচিত) গ্রন্থে সাম্রাজ্যবাদের যে চরিত্র বিশ্লেষণ করে গেছেন তা সাম্প্রতিককালেও অক্ষুণ্ন রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী পর্যায়ে শোষণ আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করায় সমগ্র বিশ্ব শোষিত ও শোষক–এ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ফলে সাম্প্রতিককালে পুঁজিবাদী উৎপাদনের ব্যাপক আন্তর্জাতিকীকরণ ও পুঁজির অবাধ চলাচল জন্ম দিচ্ছে সমাধানহীন পুঁজি সংকটের যা দেশে দেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা এবং অস্থিতিশীলতার জন্ম দিচ্ছে।

সাম্প্রতিককালে সাম্রাজ্যবাদ বা পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যের ধারণাটিকে বিশ্বায়নের বিচারমূলক অধ্যয়নের সঙ্গে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। ফলে বিশ্বায়নের নিরপেক্ষ খোলসের আড়ালে সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্যগুলো ক্রিয়াশীল থাকছে। তাই বর্তমান সময়েও লেনিন বর্ণিত সাম্রাজ্যবাদের সকল বৈশিষ্ট্য, প্রবণতা ও স্ববিরোধগুলো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। সাম্প্রতিক আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেও উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন, বিশ্ব অর্থনীতিতে একচেটিয়ার ব্যাপক প্রভাব, ব্যাংকের বিশেষ ভূমিকা, অর্থনীতিতে ফিন্যান্স পুঁজির বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বিস্তার, পুঁজি রপ্তানির ব্যাপক প্রাধান্য, পুঁজিবাদী মিত্রজোট কর্তৃক এ বিশ্বের বণ্টন এবং বৃহৎ শক্তিবর্গ দ্বারা এ বিশ্বের পুনর্বণ্টনের প্রবণতা

---

*অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাই লেনিন প্রদত্ত সাম্রাজ্যবাদের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের সাম্প্রতিক কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখা প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়।

উৎপাদন ও পুঁজির ব্যাপক কেন্দ্রীভবন ও পুঞ্জীভবন

ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর একত্রিকরণের কারণে পুঁজির পুঞ্জীভবন এখন উৎকর্ষের এক চরম পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। এটি প্রকৃতপক্ষে উৎপাদন ও পুঁজির ব্যাপক কেন্দ্রীকরণেরই ফলশ্রুতি। এ ব্যাপক কেন্দ্রীকরণ উত্তরোত্তর পুঁজিবাদকে অধিকতর একচেটিয়ার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ফলে স্বল্পসংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠান সমাজের বেশির ভাগ উৎপাদন করছে এবং শ্রমিক শ্রেণির বেশির ভাগ অংশকে নিয়োগ করছে। সেই সঙ্গে সারা বিশ্বে শ্রমিকদের দারিদ্র্য ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৯৫৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ৫০০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক সম্পদ উৎপাদন করত এবং সারা দেশের মোট মুনাফার শতকরা ৬৮ ভাগ তারা অর্জন করত। এ ৫০০টি প্রতিষ্ঠানের মাত্র ৫০টি যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র সম্পদের এক-চতুর্থাংশ উৎপাদন করত। সেসময়ে যুক্তরাষ্ট্রে মোট শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল এক লক্ষের ওপরে। ১৯৬০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ১ লক্ষ আশি হাজার শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাত্র ৫০০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান মোট উৎপাদনের শতকরা ৫৭ ভাগ উৎপাদন করত এবং লাভ করত মোট লাভের শতকরা ৭২ ভাগ, এতে কাজ করত মোট শ্রমিকের শতকরা ৫৪ ভাগ। আবার এ ৫০০টি কোম্পানির মধ্যে বৃহৎ ৪০টি উৎপাদন করত বাকি ৪৬০টির সমান। একইভাবে বৃটেনে ও পশ্চিম জার্মানিতেও একচেটিয়া কারবার ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। ১৯৬২ সালের হিসাবে মাত্র ২০০টি একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান সমগ্র পুঁজিবাদী বিশ্বের মোট উৎপাদনের শতকরা ৩২.৬ ভাগ উৎপাদন করে আর তার মূল্য হলো ২৩৫,০০০ মিলিয়ন ডলার। তন্মধ্যে ১০০টি মার্কিনি একচেটিয়া কারবারের উৎপাদন হলো ১৪৬,০০০ মিলিয়ন ডলার।[৬] ১৯৯২ সালের হিসাব অনুযায়ী, ২০০টি একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান বিশ্বের মোট উৎপাদনের ২৯.৮ শতাংশ উৎপাদন করে বিশ্ব অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এসব একচেটিয়া কারবারের ৬০টি আমেরিকান এবং ৫৪টি জাপানি। বিগত তিন দশকে বিশ্বের মোট উৎপাদন ৮ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিশ্বের মাত্র ৫ শতাংশ মানুষ বাস করে এমন দেশে ৩৫৮টি মিলিয়নিয়ার পরিবার অধিক সম্পদ অর্জন করেছে। ১৯৯৫ সাল থেকে পুঁজির ব্যাপক কেন্দ্রীকরণের ফলে একীভূত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পদ ১০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। অল্প কয়েক বছর আগেই আমরা লক্ষ করেছি, জার্মানির ডেইমলার বেঞ্জ আমেরিকার ক্রিস্টাল কোম্পানির মালিকানা গ্রহণ করে। অপরদিকে, ব্রিটিশ মালিকানাধীন বিপি শেলের অধিগ্রহণ করে ব্রিটিশ-ডাচ অংশীদারিত্ব গড়ে তুলেছে।[৭]

বর্তমানে আফ্রিকা মহাদেশের দেশগুলোর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাত্র ৬ ভাগ হয়ে থাকে নিজেদের মধ্যে। বাকি সবটুকুই হয় ইউরোপ, জাপান ও উত্তর আমেরিকার বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে। এ ধরনের বাণিজ্য সবসময়ই অসম হয়ে থাকে। তৃতীয় বিশ্বকে তাদের কফি, তুলা, মাংস, টিন, তামা ও তেল বিদেশি কর্পোরেশনগুলোর কাছে কম দামে বিক্রি করতে হয়। অপরদিকে, ধনী দেশগুলো থেকে তৈরি পণ্য, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ কেনার জন্য দিতে হয় অত্যন্ত চড়াদাম। এ সম্পর্কে ভেনিজুয়েলার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট কার্লোস আন্দ্রেজ পেরেজ বলেন, এর ফলে অবিরাম ও বর্ধিত হারে পুঁজির নির্গমন ঘটছে এবং আমাদের দেশগুলো দরিদ্র হয়ে পড়ছে।[৮] এমনকি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো পণ্য আমদানির পরিবর্তে শিল্পজ দ্রব্য নিজেরা তৈরি করলে শিল্পোন্নত দেশগুলো তাদের প্রযুক্তি ও ঋণ প্রদান বন্ধ করাসহ বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুমকি দেয়। আবার

বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো বিপুল বিনিয়োগ বিপণনের উন্নত কৌশল, একচেটিয়া পেটেন্ট এবং উন্নত ব্যবস্থাপনা দিয়ে তৃতীয় বিশ্বের স্থানীয় বাণিজ্য উদ্যোগগুলোকে বাজারে ঢুকতে বাধা প্রদান করে। তাই গরিব দেশের অর্ধেকেরও বেশি শিল্প কারখানার মালিকানা অথবা নিয়ন্ত্রণ বিদেশি কোম্পানিগুলোর হাতে। আবার যেসব ক্ষেত্রে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর শরিকানা কম, সেখানে থাকে তাদের ভেটো ক্ষমতা। কোনো শিল্প-উদ্যোগের সম্পূর্ণ মালিকানা কোনো একটি দেশের হওয়া সত্ত্বেও প্রযুক্তি ও আন্তর্জাতিক বাজারের ওপর প্রায় একচেটিয়া অধিকারের কারণে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো সুবিধা ভোগ করে থাকে। যেমন, বড় কোম্পানিগুলো অশোধিত তেল উৎপাদনের মাত্র ৩৮ শতাংশের মালিক হলেও পরিশোধন ও সরবরাহের প্রায় সম্পূর্ণটাই তাদের হাতে।[৯] এ সমস্ত ঘটনাপ্রবাহ লেনিন বর্ণিত মুষ্টিমেয় কয়জনের দ্বারা অধিকাংশ মানুষের দুঃসহভাবে শোষিত হওয়ার বাস্তবতাই প্রমাণ করে।

সাম্প্রতিককালে তথ্য ও প্রযুক্তি শিল্পের ব্যাপক কেন্দ্রীভবন লেনিনীয় তত্ত্বের প্রামাণ্য বহন করে। তথ্য সংগ্রহের শাখাগুলো গুটিকয়েক বৃহৎ কোম্পানির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ২০০৫ সালের ইউরোস্ট্যাটের জরিপ অনুসারে, বৃহৎ কোম্পানিগুলো ডাক ও টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে অন্যসব কোম্পানিকে মাত্র .৯ শতাংশ উৎপাদনের উপকরণ সরবরাহ করলেও মোট কর্মচারীর শতকরা ৮৭.৮ শতাংশের মজুরি দেয়, মোট ব্যবসায়িক লেন-দেনের ৮৭.২ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে এবং মোট মুনাফার শতকরা ৯১.৭ শতাংশ অর্জন করে। একইভাবে, যোগাযোগের উপকরণ তৈরিতে বৃহৎ কোম্পানিগুলো অন্যান্য সব কোম্পানিকে মাত্র ১.৬ শতাংশ উপাদান সরবরাহ করলেও সকল কর্মচারীর শতকরা ৬৫.৫ শতাংশের মজুরি দেয়, মোট উৎপাদনের শতকরা ৮৪.১ শতাংশ এরা করে এবং মোট মুনাফার ৭৬.৮ শতাংশ অর্জন করে। এভাবেই ইউরোপের গুটিকয়েক কোম্পানি ইউরোভুক্ত সব কয়টি দেশের তথ্য-প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণ করে। একই ধরনের কেন্দ্রীভবন প্রক্রিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থশিল্পেও লক্ষণীয়। সমগ্র মার্কিন মিডিয়া জগতকে মাত্র ৩৩০টি বৃহৎ কর্পোরেশন নিয়ন্ত্রণ করে যাদের ১০০০-এর মত কর্মচারী রয়েছে। এসব কর্পোরেশন অন্যসব কর্পোরেশনকে ২০০২ সালে মাত্র .০১ শতাংশ আর্থিক সহায়তা প্রদান করলেও তাদের সকল আয় খাতের শতকরা ৭৮ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। টেলিযোগাযোগ খাতে মাত্র ৭২টি বৃহৎ কর্পোরেশন অন্যসব কোম্পানিকে মাত্র .৯ শতাংশ আর্থিক সহায়তা দিলেও তাদের আয়ের সকল খাতের ওপর ৮৮ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।[১০]

তথ্যশিল্পের মতো খনি থেকে কয়লা ও পিট উত্তোলনের ক্ষেত্রেও বৃহৎ কোম্পানিগুলো দ্বারা কেন্দ্রীভবনের প্রবণতা বিদ্যমান। ইউরোস্ট্যাটের ২০০৫ সালের তথ্য অনুযায়ী, এ কাজে বৃহৎ কোম্পানিগুলো অন্যান্য কোম্পানিগুলোকে মাত্র ৪.৯ শতাংশ আর্থিক সহায়তা প্রদান করলেও তারাই এ খাতে ৯২.৯ শতাংশ মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে। তেমনিভাবে তামাক জাতীয় পণ্য উৎপাদনেও বৃহৎ কোম্পানিগুলো মাত্র ২০ শতাংশ উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত থেকেই এ শিল্পের ৯৩.৭ শতাংশ মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। একইভাবে কোকাকোলা উৎপাদনেও পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম ও পারমাণবিক জীবাশ্ম তৈরির কাজ বৃহৎ কোম্পানিগুলো মাত্র ৯.৯ শতাংশ করলেও এ খাতের ৯৩.১% নিয়ন্ত্রণ করে।[১১] আর জীবাশ্ম জ্বালানি বিশেষত পেট্রোলিয়াম বিপুলভাবে ব্যবহার করাই বর্তমান বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির কাঠামোর অন্তর্গত। এ বিশ্বব্যবস্থা তাই সহজপ্রাপ্য তেল ফুরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছে তাকে বলা চলে 'সর্বাধিক তেল আহরণের কর্মনীতি'। এ সম্পর্কে র‍্যাচেল কারসন মন্তব্য করেছিলেন, এ হচ্ছে "মুনাফা, আর উৎপাদন দেবতাদের" প্রশান্ত করা।[১২]

১৯৮০ সাল থেকে বিশ্বের তেলশিল্প কেন্দ্রীভবন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর কেন্দ্রীভবনের কাজটি সম্পাদিত হয়েছে বিপি-এ্যামোকো, শেভরন-টেক্সাকো, এক্সন-মবিল, কনকো ফিলিপস, শেল–এসব সর্ববৃহৎ কোম্পানিগুলো দ্বারা। এসব কোম্পানি এ খাতে ১০০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি মুনাফা অর্জন করে। অন্যান্য বৃহৎ কোম্পানিগুলো ৩০ থেকে ১০০ বিলিয়ন ডলার মুনাফা অর্জন করে। স্বতন্ত্র কোম্পানি ও শেয়ার মার্কেটের দালালরা এক্ষেত্রে ৩০ বিলিয়ন ডলার মুনাফা অর্জন করে । সর্ববৃহৎ কোম্পানিগুলো এখনও তাদের চিরাচরিত অনুসন্ধান ক্রিয়া ব্যাপকভাবে অব্যাহত রেখেছে। স্বতন্ত্র কোম্পানিগুলো এখন অনুসন্ধানের সঙ্গে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত হয়েছে। তারা তাদের মুনাফার অধিকাংশই পেয়ে থাকে পরিশোধন ও রাসায়নিক শিল্প কারখানাগুলো থেকে এবং এসব ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানই আবার বিকল্প শক্তির উৎস তথা পারমাণবিক শক্তি প্রস্তুত ও বাজারজাতকরণে ব্যাপৃত হয়। এই ব্যাপক কেন্দ্রীভবনের ফলে বহু দেশ তাদের পেট্রোলিয়াম কোম্পানিগুলোকে ব্যক্তি মালিকানাধীন আন্তর্জাতিক কোম্পানিতে পরিণত করছে। একারণে আধুনিক যুগের শুরুতেই তেলসমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে অশোধিত পেট্রোলিয়াম জোরপূর্বক আদায়কারী কোম্পানিগুলোর সংঘাত আসন্ন হয়ে ওঠে। দক্ষিণ-পূর্ব নাইজেরিয়ার সংঘর্ষ ও ইরাক যুদ্ধ সাম্প্রতিককালে এ বাস্তবতারই স্বাক্ষর বহন করে।[১৩]

যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা শক্তিগুলো বহুজাতিক তেল কোম্পানিগুলোর হাতে যাবতীয় তেল মজুদ ও বিনিয়োগের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার জন্যই তাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতির নীতি নির্ধারণ করে। একারণে তারা প্রায়শই বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তেল কোম্পানিগুলোকে ব্যক্তি মালিকানাধীন করার সুপারিশ করে। এ সম্পর্কে জেমস হাওয়ার্ড কুন্সটলার *দি লং ইমার্জেন্সি* গ্রন্থে মন্তব্য করেন, "এক মরিয়া পরাশক্তি এ গ্রহে এখনও টিকে থাকা বৃহত্তম তেলক্ষেত্রগুলো যেকোনো খেসারত দিয়ে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই বলে মনে করতে পারে।"[১৪] অর্থাৎ, যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যগত উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে "তেল উৎপাদকদের একচেটিয়া ক্ষমতা"[১৫] নিশ্চিত করা। বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরাও এ মতের সমর্থনে যুক্তি দিয়ে থাকেন, বহুজাতিক তেল কোম্পানিগুলোর এহেন জোরপূর্বক তেল দখলের খেসারত দিতে হচ্ছে পরিবেশকে।

এভাবে একচেটিয়া পুঁজি সারা বিশ্বে বিচরণ করছে এবং প্রয়োজনে নিজেদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শন করছে। উচ্চমাত্রার মুনাফা সাধারণত উচ্চমাত্রার শোষণের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। উৎপাদনের কেন্দ্রীভবনের মধ্য দিয়েই মূলত এ কাজটি সম্পন্ন হয় এবং এটিই পুঁজিবাদকে যুক্তিসিদ্ধ করে। কোম্পানিগুলোর এ ক্ষুদ্র গোত্রতান্ত্রিক শোষণ এত বেশি শক্তিধর হয়ে উঠেছে যে, কোনো সরকারই একে নিয়ন্ত্রণে আনতে সমর্থ নয়। কিন্তু গোষ্ঠীতান্ত্রিক আধিপত্য আরেকটি পুঁজিবাদী গোষ্ঠীকে ভাবিয়ে তোলে এবং প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ করে। একচেটিয়া ব্যবস্থার এ দ্বন্দ্বই কার্যত তাকে পতনের দিকে ঠেলে দিতে বাধ্য করে। এ বাস্তবতা লেনিনের ভবিষ্যদ্বাণীরই সমার্থক।

ব্যাংকের বিশেষ ভূমিকা

ব্যাপক পুঁজিবাদী পুঞ্জীভবন ও কেন্দ্রীকরণের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি হচ্ছে ব্যাংকের বিপুল বিকাশ। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর একত্রিকরণের ফলে তারা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহেরও অধিগ্রহণ করে। এর কল্যাণেই বিশ্বের প্রতি প্রান্তে ফটকামূলক পুঁজির ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। লেনিন বলেন, বিনিয়োগকৃত অর্থ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে স্ফীত হয়ে ওঠে। কর্পোরেশনগুলো পুঁজিবাদী অর্থনীতি

নিয়ন্ত্রণের জন্য এ বিপুল অর্থনৈতিক ক্ষমতা ব্যাংককে প্রদান করে বলেই তারা এ কাজটি করতে পারে।[১৬] লেনিন তাঁর সময়কালে দেখিয়ে গেছেন, কিছুসংখ্যক ব্যাংক কিভাবে মোট আমানতের বিপুল অংশ নিয়ন্ত্রণ করছে এবং তাদের কী বিপুল অংকের পুঁজি রয়েছে। সেইসঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন, ব্যাংকের বিভিন্ন কার্যক্রম কী ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বৃহৎ ব্যাংকগুলো কী বিপুল পরিমাণ মুনাফা সঞ্চয় করছে। এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, কেন্দ্রীভবনের ফলে সমগ্র পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শীর্ষে গুটিকয়েক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এর ফলে তারা একচেটিয়া চুক্তি সম্পাদন ও ব্যাংক ট্রাস্ট গঠনের দিকে অধিক তৎপরতা দেখাচ্ছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে লেনিন নির্দেশিত এ বৈশিষ্ট্যগুলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আরও প্রকট আকার ধারণ করে। এসময়ে *আইএমএফ ও আইবিআরডি* (বর্তমানে বিশ্বব্যাংক) নামক দু'টি সাধারণ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে যারা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সমগ্র বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। পুঁজিবাদী দেশগুলো *আইএমএফ*কে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার নিয়ম-কানুনের রক্ষকে পরিণত করার প্রয়াস পায়। তখন থেকেই বিনিময় হারে কোনোরূপ পরিবর্তন আনয়নের জন্য আই*এমএফ*-এর অনুমোদন প্রয়োজন হতো। অপর প্রতিষ্ঠান *আইবিআরডি* বা বিশ্বব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ তখন ছিল ১০ বিলিয়ন ডলার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ দুটো প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে এদের সম্পদের যোগান দিতে শুরু করে এবং অন্যান্য দেশকেও সম্পদ যোগানের জন্য চাপ দিতে থাকে। আইবিআরডির ঋণ প্রদানের ক্ষমতাও কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রদত্ত ৫৭০ মিলিয়ন ডলারের মধ্যেই সীমিত থাকত। তাছাড়া *আইবিআরডি* প্রদত্ত ঋণপত্রের জন্য কেবলমাত্র রক্ষণশীল ওয়াল স্ট্রীট মুদ্রা বাজারকে একমাত্র বাজার হিসেবে গণ্য করার কারণে বিশ্বব্যাংক রক্ষণশীল ঋণদান নীতি গ্রহণে বাধ্য হয়।

১৯৬০-এর দশকে বহুজাতিক ব্যাংকের সংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পায়। ১৯৬১ সালে মুদ্রা সঙ্কট নিরসনে *আইএমএফ*কে অতিরিক্ত তহবিল নিয়ন্ত্রণের ভার প্রদান করা হয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভোটের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তসমূহ নিয়ন্ত্রণ করতো। কানাডাসহ বেশকিছু ইউরোপীয় দেশ আইএমএফ-এর নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে দশটি ধনী দেশের নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব দেয়। এরপর দীর্ঘ পাঁচ বছর আলোচনার পর যৌথ চুক্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলকে কৃত্রিমভাবে পুনর্গঠন করা হয়। এতে ইউরোপীয় দেশগুলো ভেটো সুবিধা লাভ করে। ব্যাংক ব্যবস্থার এ আন্তর্জাতিকীকরণ বহুজাতিক ব্যাংকগুলোর শাখা বিস্তারে আরও সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ১৯৬৫ সালে মাত্র ১৩টি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যাংকের বৈদেশিক শাখা ছিল। ১৯৭৪ সালের শেষদিকে বৈদেশিক শাখাসহ ১২৫টি নতুন ব্যাংক খোলা হয়। ১৯৬৫ সালে বিদেশে কার্যরত এ সকল শাখার ৯.১ বিলিয়ন ডলারের তহবিল ছিল, সেখানে ১৯৭৪ সালে তা ১২৫ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে যায়। ১৯৬৫ সালে নিউ ইয়র্ক শহরে বিদেশি ব্যাংকের মাত্র ৪৯টি শাখা থাকলেও ১৯৭৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৯২টিতে। এ সকল শাখার তহবিলও ঐ সময়ে ৪.৮ বিলিয়ন ডলার থেকে ২৯ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। ১৯৭৪ সালের শেষ নাগাদ যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশি ব্যাংকের মোট তহবিলের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৬ বিলিয়ন ডলারে। ব্যাংক ব্যবস্থার আন্তর্জাতিকীকরণের আরেকটি দিক হচ্ছে আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং সহগামিতা (Consortia) ব্যবস্থার প্রবর্তন। ১৯৬৪ সাল থেকে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক যৌথভাবে আন্তর্জাতিক সিন্ডিকেটের সৃষ্টি করে এবং ১৯৭১ সালের মধ্যে বিশ্বের তিন-চতুর্থাংশ বৃহৎ ব্যাংক এ সিন্ডিকেটসমূহের অংশীদারিত্ব গ্রহণ করে। বহুজাতিক ব্যাংকসমূহ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিরাট ধরনের মূলধন স্থানান্তরের মাধ্যমে কেবল বিনিয়োগের সৃষ্টি করে না,

বরং বিনিময় হারে পরিবর্তনের সুযোগ নিয়ে ফটকাবাজারী (Speculating) করতেও সমর্থ হয়।[১৭] ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত বেসরকারি ব্যাংক দ্বারা তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর উদ্বৃত্ত আয় বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। কারণ তেল উৎপাদক দেশগুলো এসব ব্যাংকে তাদের অর্থ জমা রাখত এবং তা থেকে তেল আমদানিকারক দেশগুলোকে ঋণ দেয়া হয়। এছাড়াও তেল উৎপাদনের দেশগুলো থেকে সরকারি বিলের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ঋণ হিসেবে এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে তেল তহবিল সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া *আইএমএফ* এবং বিশ্বব্যাংকের মতো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোও তেল রাজস্ব হস্তান্তরে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এসব প্রতিষ্ঠান তেল রপ্তানিকারক দেশগুলো থেকে ঋণ সংগ্রহ করে তেল আমদানিকারক দেশগুলোতে ঋণ সরবরাহ করে। সুতরাং, বেসরকারি ব্যাংকিং ব্যবস্থা অর্থ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকের মৌলিক দায়িত্ব পালন করে।

১৯৭০-এর দশকব্যাপী বেসরকারি ব্যাংকগুলো তেল রাজস্বের রিসাইক্লিং প্রক্রিয়ায় প্রধান ভূমিকা পালন করে। এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংকগুলো ইউরোপীয় মুদ্রায় বিপুল পরিমাণ আমানত সৃষ্টি করে এবং আন্তর্জাতিক ঋণদানের সদর দফতরে পরিণত হয়।[১৮] ১৯৭৮ সালে বিনিময় হার তত্ত্বাবধান, জাতীয় নীতিসমূহ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন নীতিমালার প্রয়োগ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা উৎসাহিত করার দায়িত্ব *আইএমএফ*-এর উপর অর্পিত হয়। এছাড়াও একটি কাউন্সিল গঠন করে আন্তর্জাতিক মুদ্রা পরিস্থিতির নিরীক্ষণ, বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা, পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার সমন্বয় সাধন, আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাজারের তারল্য নিশ্চিতকরণ এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে সম্পদের হস্তান্তরের দায়িত্বও তারা গ্রহণ করে।[১৯] যেসব দেশ *আইএমএফ*-এর কাছ থেকে বর্ধিত হারে ঋণ গ্রহণ করে, সেসব দেশের নীতি প্রভাবিত করার ক্ষমতাও *আইএমএফ*কে দেয়া হয়। তবে এসব ক্ষমতা কেবল দুর্বল রাষ্ট্রের ওপরই প্রয়োগ করা হতো। গ্রেট ব্রিটেন ১৯৭৬ সালে আইএমএফ থেকে ঋণ গ্রহণ করলেও আইএমএফ তার ওপর কোনো প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি।[২০]

১৯৭৮ সালে লক্ষ্য করা যায়, উন্নয়নশীল দেশগুলো বিশ্বব্যাংক থেকে যে ঋণ গ্রহণ করে, প্রকৃতপক্ষে তার চেয়ে বেশি পরিশোধ করে।[২১] প্রকৃতপক্ষে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনুন্নত ও উন্নত দেশগুলোর মধ্যে অসম সম্পর্কের কারণে গরিব দেশগুলো আমেরিকা ও অন্যান্য পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ব্যাংকগুলো ও *আইএমএফ* থেকে ঋণ নেয়াকে সহজ পথ হিসেবে বিবেচনা করে। তৃতীয় বিশ্বের এই ঋণের পরিমাণ ১৯৯০ সালে ছিল দুই ট্রিলিয়ন বা দুই লক্ষ কোটি ডলার। এই বিপুল ঋণ শোধ করার ক্ষমতা তৃতীয় বিশ্বের নেই। যে দেশের ঋণের পরিমাণ যত বেশি, ঘাটতি মেটাতে আরও ঋণ নেবার চাপও তাদের ওপর ততোধিক। আর অধিকাংশ সময়েই এ বাড়তি ঋণ দিতে হয় চড়া সুদে, কড়া শর্তে। একারণে ঋণগ্রস্ত দেশের আয়ের একটা বড় অংশ চলে যায় ঋণ পরিশোধে, দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে তার সামান্যই অবশিষ্ট থাকে। কোনো দেশের ঋণের পরিমাণ এতই বেশি যে তাদের শোধ দেবার ক্ষমতার চেয়ে দ্রুত হারে এর সুদ বাড়তে থাকে। এই ঋণ এক সর্বগ্রাসী রূপ নিয়ে খাতক দেশের জাতীয় সম্পদ আরও অধিক হারে নিঃশেষ করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আশির দশকের শেষভাগে প্যারাগুয়ের রপ্তানি আয়ের ৮০ শতাংশই চলে যায় বৈদেশিক ঋণের সুদ পরিশোধে। অধিকাংশ খাতক দেশকেই তাদের ঋণ পরিশোধে তাদের রপ্তানি আয়ের এক-তৃতীয়াংশ থেকে দুই-তৃতীয়াংশ ব্যয় করতে হয়। দেখা গেছে যে, ১৯৮৩ সালের দিকে বিদেশি ব্যাংকগুলো তৃতীয় বিশ্বে প্রদত্ত ঋণ থেকে যে পরিমাণ সুদ পেয়েছে তা সেখানে তাদের প্রাপ্ত মুনাফার চেয়ে তিন গুণ বেশি। এ সমস্যা আরও প্রকট করার জন্য গরিব দেশগুলোর মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটানো হয়। এ

সংকট নিরসনে ফিদেল ক্যাস্ত্রো দরিদ্র দেশগুলোকে এই অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে নিজেদের মুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু ঋণ পরিশোধে অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকারী দেশের বৈদেশিক একাউন্ট আটকে রাখা, বৈদেশিক সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা এবং রপ্তানি বাজার হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়ে যায়। তাই ঋণখেলাপি হয়ে পড়ার আশঙ্কায় দরিদ্র দেশগুলোকে আরও ঋণ নিতে হয়। কিন্তু নতুন ঋণ পাবার যোগ্যতা অর্জনের জন্য কোনো দেশকে অবশ্যই আইএমএফ প্রদত্ত কাঠামো পুনর্বিন্যাসের শর্তে রাজি হতে হয়।[২২]

বিশ্বব্যাংক সম্পর্কে মাইকেল প্যারেন্টির বক্তব্য হলো: শ্রেণি পক্ষপাতে দুষ্ট বৈদেশিক সাহায্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হচ্ছে বিশ্বব্যাংক। এ প্রতিষ্ঠানটি ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদদের এক আন্তর্জাতিক কনসোর্টিয়াম যেখানে অনেকগুলো ব্যবস্থা পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এ ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদরা এমন সব প্রকল্পে শত শত কোটি ডলার যোগান দেয়, যে প্রকল্পগুলো অত্যাচারী দক্ষিণপন্থী শাসকগোষ্ঠীর অবস্থান শক্তিশালী করে এবং বড় ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগকারীদের ভর্তুকি যোগায়। এসব প্রকল্প আবার গরীবদের স্বার্থের বিপক্ষে কাজ করে। এমনকি পরিবেশের জন্যও ক্ষতিকারক হয়ে ওঠে। কিন্তু এই শত শত কোটি ডলারের বেশির ভাগই আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের করের অর্থ থেকে।

আশির দশকে বিশ্বব্যাংক উত্তর-পশ্চিম ব্রাজিলে বর্ষণ বন ধ্বংস করে এক মহাসড়ক নির্মাণ করে এবং কয়েক লক্ষ একর বনভূমি নিধন করে। ধনী ব্রাজিলিয়ান পশু খামারমালিকদের ব্যবসায়িক স্বার্থে সস্তা চারণভূমি তৈরির জন্যই এভাবে বনভূমি ধ্বংস করা হয়। এরপর ব্রাজিলীয় সরকার দরিদ্র মানুষকে শহর থেকে হটিয়ে মহাসড়কের কাছে পাঠিয়ে দেয়। ফলে পুরো এলাকা উজাড় হয়ে সম্পূর্ণ বনভূমি বৃক্ষহীন হয়ে পড়ে। বিশ্বব্যাংকের এহেন কার্যকলাপ সম্পর্কে জিম হাইটাওয়ারের[২৩] মন্তব্য হলো: "বিশ্বব্যাংক মাত্র ৫০ বছরে যা করেছে, পৃথিবীর সব ব্যাংক ডাকাতরা মিলে এ পর্যন্ত তার এক শতাংশের এক দশমাংশও করতে পারেনি।[২৪] এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, লেনিনের সময়কালে সাম্রাজ্যবাদের সূচনালগ্নে ব্যাংক সবেমাত্র শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। আজকের দিনে সে শোষণ আরও পরিণত রূপ লাভ করে প্রতিক্রিয়াশীলতার সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছেছে।

ফিন্যান্স পুঁজি ও ফিন্যান্সিয়াল অলিগর্কি

সাম্রাজ্যবাদী দেশে ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠী (ফিন্যান্সিয়াল অলিগর্কি) সমস্ত ব্যাংক ও শিল্পপুঁজির (যার সংমিশ্রণে ফিন্যান্স পুঁজির জন্ম) ওপর একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৯১২ সালে লেনিন লক্ষ করেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের এক তৃতীয়াংশ সম্পদ মরগ্যান ও রকফেলারের হাতে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের জনসমষ্টির শতকরা ৯ ভাগের হাতে দেশের শতকরা ৫৯ ভাগ সম্পদ ছিল। বৃটেনেও মাত্র ৮টি ধনী পরিবারের হাতেই ছিল সম্পদের মূল নিয়ন্ত্রণক্ষমতা।[২৩] ২০০৮ সালে ফোরবস-এর জরিপ অনুযায়ী, এ বছর ফিন্যান্স কোম্পানি ও ফিন্যান্সিয়াল কর্পোরেশনগুলো (ব্যাংকিং, ফিন্যান্সিয়াল ও ইনস্যুরেন্স) মোট পরিসম্পদের ৭৫.৯৬% এর মালিক। ২০০৯ সালে ফিন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাপক ব্যবসায়িক ক্ষতির পরেও মোট পরিসম্পদের শতকরা ৭৪.৯ শতাংশের মালিক রয়ে গেছে।[২৫]

ব্যাংক ও ফিন্যান্স পুঁজির এ ব্যাপক প্রভাব প্রমাণ করে যে, এ বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা ৬০ শতাংশ পুঁজি উৎপাদনশীল বিনিয়োগের সঙ্গে জড়িত নয়, বরং ফিন্যান্সিয়াল ফটকাবাজি বিনিয়োগের সঙ্গে জড়িত। লেনিন তাঁর তত্ত্বে উল্লেখ করেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদী যুগে অলস একটি শ্রেণি বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়ে ওঠে। একারণে আন্তর্জাতিক মুদ্রা, বিনিময় ও শেয়ার বাজার এ বিশ্বের পণ্য দ্রব্যের বাণিজ্যের চেয়ে ১৯ গুণ বেশি। তাই স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শিল্পগত মুনাফা কমে যাওয়ায় উৎপাদনে নিয়োজিত বিনিয়োগের পরিমাণও কমে গেছে। এ থেকে সৃষ্টি হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি। এ সমস্ত পরিস্থিতি পুঁজিপতিদের পরাশ্রয়ী চরিত্রেরই স্বাক্ষর বহন করে যা সম্পূর্ণ উৎপাদনশীল চরিত্রের বিপরীত, কিন্তু এ গোষ্ঠীটিই এখন সামাজিকভাবে বেড়ে চলেছে এবং তাদের কতিপয় বৈশিষ্ট্যই আজকের যুগের সাম্রাজ্যবাদী জাতির ভিত্তি নির্মাণ করছে। সাম্রাজ্যবাদী নীতিমালার মাধ্যমে শিল্প পুঁজির তুলনায় ফটকামূলক ফিন্যান্স পুঁজি রক্ষা করা হয়। যদিও বিশ্ববাজার সংকুচিত হয়ে পড়ায় এটি উপলব্ধি করা সহজ নয়। ফটকামূলক বিনিয়োগ থেকে অর্জিত মুনাফা শিল্প মুনাফার সঙ্গে যুক্ত হয়। এর ফলে শ্রমিক শোষণ আরও বেড়ে যায়। *ও. ই.সি.ডি*[২৬] মাধ্যমে যে বহুপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি (MAT) স্থাপিত হয় তাতে ফিন্যান্স পুঁজির ভিত্তিতে শিল্পবাজার পুনর্গঠনের উদ্যোগ ছিল। এটি প্রকৃতপক্ষে ফটকামূলক বাজারে মূল্যবান বিনিয়োগকে রক্ষা করার কৌশল হিসেবেই কাজ করেছে।

মুনাফা বৃদ্ধির এ ধরনের কৌশল সাম্রাজ্যবাদী যুগে ফিন্যান্স পুঁজিকে পুঁজিবাদী দ্বন্দ্বের প্রধান হাতিয়ারে পরিণত করে। এটি বিশ্ব অর্থনীতিকে এক অপ্রত্যাশিত সংকটের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। ফিন্যান্স পুঁজি সাম্প্রতিককালে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক খাতকেই নিয়ন্ত্রণ করছে না, সামাজিক খাত ও কূটনীতিতেও প্রভাব বিস্তার করছে। 'টিকুইলা প্রভাব'[২৭] নামে পরিচিত সাম্প্রতিক আর্থিক বিপর্যয়, এশিয়ান সংকট, মস্কো স্টক এক্সচেঞ্জ সংকট–এসবই বিশ্ব অর্থনীতিতে শিল্প পুঁজির ওপর ফিন্যান্স পুঁজির আধিপত্যের কারণেই সংঘটিত হচ্ছে। এ বৈশিষ্ট্যটিই লেনিন কর্তৃক বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে ফিন্যান্স পুঁজি নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার কারণেই বিশ্বব্যাপী সংকট দেখা দিচ্ছে। অন্যদিকে, ফিন্যান্সিয়াল দানবরূপে পরিচিত জাপান, জার্মানি, ফ্রান্স এবং যুক্তরাষ্ট্রের মতো সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মধ্যে সংঘাতের সম্ভাবনাও রয়ে যাচ্ছে বিশ্বের আর্থিক ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে। কারণ আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক এবং বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার মতো আর্থিক ব্যবস্থাপনাগুলোই আন্তর্জাতিক ফিন্যান্স পুঁজির প্রধান উপকরণ হিসেবে কাজ করে।[২৮]

পুঁজির রপ্তানি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে অদ্যাবধি দেখা গেছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিপতিদের নিজেদের দেশে লগ্নীকৃত পুঁজি থেকে আদায়কৃত মুনাফা যত বৃদ্ধি পেয়েছে, তার চেয়ে চার-পাঁচ গুণ বেশি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে অনুন্নত বিশ্বে লগ্নীকৃত পুঁজি থেকে আদায়কৃত মুনাফা।[২৯] বিগত কয়েক দশকে মার্কিন কোম্পানিগুলো অন্যান্য দেশে তাদের খরচ তিন গুণ বৃদ্ধি করেছে। এর মধ্যে তৃতীয় বিশ্বে বৃদ্ধি ঘটেছে সর্বাধিক দ্রুত হারে। মার্কিন পুঁজিবাদ বর্তমানে যা রপ্তানি করে, তার চেয়ে আট গুণ বেশি পণ্য বিদেশে উৎপাদন করে। অনেক কোম্পানিই তাদের সব উৎপাদন কর্মকাণ্ড বিদেশে সরিয়ে ফেলেছে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি হওয়া ক্যামেরা, সাইকেল, টেপ রেকর্ডার, রেডিও, টেলিভিশন, ভিসিআর, কম্পিউটার ইত্যাদির সবগুলো বা অধিকাংশই বিদেশে তৈরি।

মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর কর্মচারীদের প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন বিদেশে কাজ করে। মার্কিন কোম্পানিগুলো প্রতি বছর হাজার হাজার কাজ বিদেশে সরিয়ে নিচ্ছে। কোনো কারখানাকে বিদেশে সরিয়ে ফেলা হবে– এ ভয় দেখিয়ে অধিকাংশ সময় মার্কিন শ্রমিকদের মজুরি ও ভাতাদি কর্তন মেনে নিতে ও অধিক সময় ধরে কাজ করতে বাধ্য করা হয়।

তাছাড়া বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বিদেশে যে মুনাফা করে, সেই মুনাফা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত তাদের এজন্য যুক্তরাষ্ট্রে কোনো কর দিতে হয় না। আবার স্বাগতিক দেশে দেয়া করকে দেশেও করযোগ্য আয় থেকে বিনিয়োজিত অংশ হিসেবে না ধরে প্রদত্ত কর হিসেবে গণ্য করা হয়। এছাড়াও বহুজাতিক কোম্পানিগুলো তাদের বিভিন্ন সহযোগী বা শাখা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কাগজপত্রে অর্থ লেন-দেন করে এমনভাবে হিসেব দেখায় যে, তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বছরে কমপক্ষে দু'হাজার কোটি ডলার কর দিতে হয় না[৩০]। সাম্প্রতিক 'ফিসক্যাল ক্লিফ' নামে পরিচিত মার্কিন অর্থনৈতিক কর্মসূচীর আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ আয়ের নাগরিকদের কর বাড়ানোর প্রস্তাব পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে রিপাবলিকান পার্টির কট্টরপন্থী নেতাদের বিরোধিতায় প্রথম দফা আলোচনায় বাতিল হয়ে যায়। অথচ, এ বিল পাস হলে ৯৯.৮ শতাংশ মার্কিন জনগণের কর হ্রাসের বিষয়টি নিশ্চিত হতো এবং যাদের আয় দশ লাখ ডলারের বেশি তাদের ক্ষেত্রেই কর কার্যকর হতো।[৩১] সুতরাং, মার্কিন সাম্রাজ্য যে সেদেশের গুটিকয়েক ধনিক শ্রেণির কল্যাণেই নিয়োজিত এটি তারই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

এ সম্পর্কে মাইকেল প্যারেন্টি বলেন, সাম্রাজ্যের সুবিধাদি কখনোই আমেরিকার ভোক্তাদের লাভবান করে না। সাধারণত তৃতীয় বিশ্বের শ্রমিকদের ভয়ানকভাবে শোষণ করে উৎপাদিত পণ্যাদি যত সম্ভব চড়াদামে আমেরিকার বাজারে বিক্রি করা হয়। যেমন, ইন্দোনেশিয়াতে নাইকির যে জুতো বানাতে সাত ডলার খরচ হয়, সেই জুতোই আমেরিকাতে বিক্রি করা হয় ১৩০ ডলার বা তারও বেশি দামে। এজন্য নাইকি কোম্পানি বা তার ঠিকাদাররা ইন্দোনেশিয়ার নারী শ্রমিকদের ঘন্টায় মাত্র ১৮ সেন্ট মজুরি দেয়। এ্যাডমিরাল ইন্টারন্যাশনালের প্রেসিডেন্ট তাইওয়ানে কারখানা নিয়ে যাওয়ার কারণ অত্যন্ত খোলামেলাভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, এতে দেশের ভেতরে দামের কোনো তারতম্য ঘটবে না। কিন্তু কোম্পানির মুনাফা বাড়বে। এছাড়া বিদেশে কারখানা নেয়ার কোনো যৌক্তিকতা থাকে না।

এ ধরনের বৈদেশিক বিনিয়োগ তৃতীয় বিশ্বের জন্যও কোনো বিশেষ সুবিধা সৃষ্টি করে না। ১৯৬০ সালে বৈদেশিক বিনিয়োগের ফলে ব্রাজিলে প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির ফলেও দারিদ্র বেড়ে যায় ও খাদ্যাভাব দেখা দেয়। কেননা, এতে ব্রাজিলের জনসাধারণের প্রয়োজন উপেক্ষা করে দেশের ভূমি ও শ্রমশক্তিকে ক্রমবর্ধমানভাবে রপ্তানির জন্য অর্থকরী কৃষিপণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত করা হয়েছিল।[৩২] বহুজাতিক কর্পোরেশনের এ ধরনের বিনিয়োগের নেতিবাচক দিকগুলো অনেক সমালোচকই তুলে ধরেছেন। তারা যুক্তি দেন যে, এসব আন্তর্জাতিক একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান দক্ষতা কমাতে পারে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে শ্বাসরুদ্ধ করে রাখে। প্রতিযোগিতার অনুপস্থিতিতে এসব কর্পোরেশন উৎপাদন সীমিত রাখে, কৃত্রিমভাবে উচ্চমূল্য বজায় রাখে এবং একচেটিয়া খাজনা আয় করতে সক্ষম হয়। এভাবে কর্পোরেশনগুলি অর্থনৈতিক দক্ষতা কমিয়ে ফেলে। এছাড়া নতুন পুঁজি যোগান দেয়ার পরিবর্তে স্থানীয় পুঁজি গ্রাস করে, অনুপযোগী প্রযুক্তি প্রয়োগ করে এবং স্বদেশি পরিচালকের পরিবর্তে বিদেশি পরিচালক নিয়োগের মাধ্যমে এসব প্রতিষ্ঠান জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে বাধার সৃষ্টি করে।[৩৩]

বহুজাতিক কর্পোরেশন যেদেশে বিনিয়োগ করে সেদেশের অভ্যন্তরীণ গবেষণা ও উন্নয়নে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে । ফলে স্বাগতিক দেশটি বহির্বিশ্ব কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত প্রযুক্তির অধীন বা শিকার হতে পারে। এ সম্পর্কিত আরেকটি ভীতি হচ্ছে আমদানিকৃত প্রযুক্তির জন্য স্বাগতিক দেশগুলোকে বেশি খরচ বহন করতে হতে পারে। কারণ একটি বহুজাতিক কর্পোরেশন কর্তৃক প্রযুক্তির একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের কারণে মালিক দেশটিকে প্রযুক্তির একচেটিয়া খরচ আদায়ে বাধ্য করে। ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। বৈদেশিক ব্যবস্থাপক নিয়োগের ফলে দেশীয় ব্যবস্থাপকরা তাদের দক্ষতা ব্যবহার ও উন্নয়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে পারে।[৩৪]

১৯৬০ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় মালিকানায় প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ মজুদের পরিমাণ ৩২.৮ বিলিয়ন থেকে ১৩৭.২ বিলিয়ন ডলারে বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য উন্নত দেশের বিনিয়োগ যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় কম হলেও তা-ও নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। এ সময়কালে পশ্চিম জার্মানির প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ মজুদ ৮ বিলিয়ন থেকে ৩২ বিলিয়নে, যুক্তরাজ্যের ১২ বিলিয়ন থেকে ৩২ বিলিয়ন ডলারে বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৪ সালে কানাডার শিল্প কারখানার শতকরা ৫২ ভাগ ছিল যুক্তরাষ্ট্রের হাতে। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত মোট বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের তিন-চতুর্থাংশ বাজারনির্ভর উন্নত দেশগুলোর মধ্যে সীমিত থাকে। ১৯৭৬ সাল নাগাদ মোট ৯১৮ বিলিয়ন ডলারের বিশ্ব রপ্তানির তুলনায় আন্তর্জাতিক উৎপাদনের মূল্য প্রায় ৮৩০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়। পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাসে বৈদেশিক মালিকানার পরিমাণ ছিল শতকরা ৫৭ ভাগ এবং এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মালিকানা ছিল ৪৫ ভাগ, খনিজ এবং ধাতু শিল্পের শতকরা ৫৬ ভাগ বৈদেশিক মালিকানাধীন ছিল যার মধ্যে ৪৫ ভাগই যুক্তরাষ্ট্রের হতে।[৩৫]

আমরা দেখতে পাচ্ছি, লেনিন প্রায় একশ বছর আগে যে পুঁজির রপ্তানি ও বিশ্ব অর্থনীতিতে ফিন্যান্স পুঁজির আধিপত্যের কথা বলেছিলেন- তা সময়ের প্রেক্ষিতে ক্রমবর্ধমান হারে শুধু বেড়েই চলেছে। ১৯৯৫ সালের (২৪ জুন) *Economist* পত্রিকার এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, ১৯৮৩ সাল থেকে পরবর্তী ১৩ বছরে সরাসরি বিদেশে বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment, সংক্ষেপে ঋউও) বাণিজ্যের পাঁচ গুণ দ্রুততর এবং বিশ্ব উৎপাদনের চেয়ে দশ গুণ দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮৫ থেকে ১৯৯০-এ পাঁচ বছরের এফডিআই বৃদ্ধি পেয়েছে বার্ষিক ৩৫ শতাংশ হারে। এই একই সময়ে বিশ্ব রপ্তানি বাণিজ্যের বৃদ্ধি ছিল বার্ষিক ১৩ শতাংশ এবং বিশ্ব জি.ডি.পি (Gross Domestic Product বা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন) বৃদ্ধির হার ছিল ১২ শতাংশ। এই এফডিআই-এর ৭০ শতাংশ এসেছে মাত্র পাঁচটি দেশ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানি, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স) থেকে। অপর এক হিসাব থেকে জানা যায় যে, তৃতীয় বিশ্বে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) ১৯৯০ সালে ছিল ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৯৯৫ সালে এ অঙ্ক বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৮৪ বিলিয়ন ডলার। আর ২০০০ সালে পুঁজির রপ্তানি বেড়ে দাঁড়ায় ১,১৪৯ বিলিয়ন ডলারে।[৩৬]

পুঁজির রপ্তানি হচ্ছে একচেটিয়া পুঁজির সর্বোচ্চ মুনাফা আদায়ের কৌশলমাত্র। আর বর্তমানে জীবাশ্ম জ্বালানি, মোটরগাড়ি ও তথ্যায়ন হচ্ছে নব্য-সাম্রাজ্যবাদের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক গতিধারা নির্মাণকারী খাত। তাই এ খাতগুলোতে ব্যাপক পুঁজি রপ্তানি ঘটছে। বিশ্ব অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ২০০৩-২০০৮ এর তথ্যানুযায়ী, কম্পিউটার ও এ সংক্রান্ত কার্যক্রম, তড়িৎ সংক্রান্ত ও ইলেকট্রনচালিত উপকরণ, মিডিয়া, মুদ্রণ ও প্রকাশনা এবং টেলিযোগাযোগসহ সকল মিডিয়া ও তথ্যশিল্পে মোট বৈদেশিক বিনিয়োগ ছিল ২০০১ সালে ৫৫.৭%, ২০০২ সালে ৫৭%, ২০০৩ সালে

৫৫.৮%, ২০০৪ সালে ৫৬.৮%, ২০০৫ সালে ৫৯.৯% এবং ২০০৬ সালে ৬১.৬%। ২০০১ সালে ২৬টি তথ্যনির্ভর বৃহৎ কর্পোরেশনের বৈদেশিক বিনিয়োগ ছিল ৬০.২%, ২০০২ সালে ২২টি বৃহৎ কর্পোরেশনের বিনিয়োগ দাঁড়ায় ৫৫%, ২০০৩ সালে ২১টি কর্পোরেশন বিনিয়োগ করে ৫৫.৯%, ২০০৫ সালে ২০টি তথ্যনির্ভর কর্পোরেশনের বিনিয়োগ ৫৯.৫% এবং ২০০৬ সালে ১৮টি বৃহৎ কর্পোরেশনের বৈশ্বিক বিনিয়োগ দাঁড়ায় ৬১.৭%। এ থেকে বোঝা যায়, তথ্যনির্ভর কর্পোরেশনগুলোর অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের চেয়ে বৈশ্বিক বিনিয়োগের পরিমাণ অনেক বেশি।[৩৭]

সরাসরি বিনিয়োগ ছাড়া পুঁজির রপ্তানি ঋণের আকারে হতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে তৃতীয় বিশ্বে বৈদেশিক ঋণ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার নামে বা মাধ্যমেও আসে তা আমরা ইতোমধ্যেই আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বর্ধিত হারে বৈদেশিক ঋণ আসতে শুরু করে। বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, স্বল্প আয়ের দেশগুলোর বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল ১৯৮০ সালে ১৩৪ বিলিয়ন ডলার আর ১৯৯২ সালে সেই অঙ্ক দাঁড়ায় ৪৭৪ বিলিয়ন ডলারে। ১৯৮০ সালে দেয় সুদের পরিমাণ ছিল ৬.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ১৯৯২ সালে তা দাঁড়ায় ১৮.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। আশির দশকে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের বৈদেশিক ঋণ বিশ্বে ঋণসংকট সৃষ্টি করেছিল। ঋণ নিয়ে সত্যিকারার্থে উন্নয়ন হলে আর এমন অবস্থা সৃষ্টি হতো না। ১৯৮২ সালে মেক্সিকো জানায়, তারা ঋণ পরিশোধে অক্ষম । এরপর একে একে লাতিন আমেরিকার কয়েকটি দেশ এবং ১৯৮৩-৮৪ সালে ফিলিপাইন ও সাহারা মরুর নিকটবর্তী অধিকাংশ আফ্রিকান দেশ একটি আপত্তি জানায়। এ থেকেই ঋণ সংকটের শুরু। এতে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো কিছুটা সমস্যায় পড়ে। কারণ ঋণগ্রস্ত দেশগুলো ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের বহুজাতিক ব্যাংকগুলোর দেউলিয়া হবার উপক্রম হয়। এ সমস্যা সমাধানে *আইএমএফ* ঐসব ঋণগ্রস্ত দেশকে নতুন চুক্তিতে আবদ্ধ করে এবং নতুন শর্তে ঋণ প্রদান করে। এজন্য *আইএমএফ*-কে অর্থের যোগান দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। নতুন শর্ত এমনভাবে প্রণীত হলো যার মধ্য দিয়ে ঋণগ্রস্ত দেশের পুরো অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ *আইএমএফ*-এর হাতে চলে আসলো। এভাবেই ফিন্যান্স পুঁজি ঋণের জালে আটকে রেখে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সাম্রাজ্যবাদী দেশের অধীনস্থ করে রাখে।[৩৮]

বিশ্বের অর্থনৈতিক বণ্টন

লেনিন পুঁজি রপ্তানির মধ্য দিয়ে মূলত বহির্বিশ্বে বৃহৎ কর্পোরেশনগুলোর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তুলে ধরেছেন এবং এর মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত অর্থনৈতিক সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করেছেন। বর্তমান বৈশিষ্ট্যটি এসব কর্মকাণ্ডের স্থানিক পরিধি ব্যক্ত করে। এ থেকেই বোঝা যায়, এ দুটি বৈশিষ্ট্য ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ। সাম্প্রতিককালে প্রায়ই দেখা যায়, এক কোম্পানি আরেক কোম্পানির অংশ কিনে নিচ্ছে বা দুই কোম্পানি একত্রিত হচ্ছে। যেমন, জাপানের মিৎসুভিসির ২৪ শতাংশের মালিক যুক্তরাষ্ট্রের ক্রাইসলার। যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল মটরের সাথে জাপানি কোম্পানি টয়োটার যৌথ বাণিজ্যিক উদ্যোগ আছে। ২০০০ সালে বিপুল পুঁজি রপ্তানির কারণে রাষ্ট্রীয় সীমা অতিক্রম করে অন্য কোম্পানির সাথে একীভূত হওয়া বা কোম্পানির অংশবিশেষ ক্রয় করা সহজ হয়েছে।[৩৯]

সাম্প্রতিককালে গণমাধ্যম শিল্পে সবচেয়ে বেশি কেন্দ্রীকরণ ও একত্রীকরণের ফলে এ শিল্পে এখন ব্যাপক একচেটিয়া সমাহার সৃষ্টি হয়েছে। তাই বৈশ্বিক গণমাধ্যম বাজার বিশ্বের সর্ববৃহৎ নয় বা দশটি বহুজাতিক কোম্পানির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এসব ফার্মের বিশ্বব্যাপী বিতরণ ব্যবস্থা রয়েছে।

এছাড়া বাণিজ্যিক প্রকাশনা ফার্মের অর্ধাংশ উত্তর আমেরিকার দখলে এবং বাকি অর্ধাংশ পশ্চিম ইউরোপ ও জাপানের অধিকারে। সম্মিলিতভাবে এই ৫০/৬০টি ফার্ম বিশ্বের বইয়ের প্রকাশনা, ম্যাগাজিন প্রকাশনা, মিউজিক রেকর্ডিং, টিভি স্টেশন ও ক্যাবল চ্যানেলের মালিকানাসত্ত্ব, স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলের মালিকানাসত্ত্ব, চলচ্চিত্র তৈরি, থিয়েটারের মালিকানা সত্ত্ব এবং সংবাদপত্র প্রকাশনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। বৈশ্বিক গণমাধ্যম বাজারে একীভূত হওয়ার অর্থনৈতিক সুবিধা প্রচুর। বড় ফার্মগুলোর সাথে যুক্ত না হয়ে ছোট ফার্মগুলো বাজারে প্রতিযোগিতা করতে পারে না। যেমন, গণমাধ্যমে নিজেদের অভিন্নতাকে তুলে ধরার জন্য সনি ব্ল্যাকস্টোন গ্রুপের বিনিয়োগ ভাড়া করেছে। মিউজিক্যাল প্রতিষ্ঠান ই.এম.আই-এর মতো ফার্মগুলো অন্য পাঁচ বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলোর যেকোনো একটির সাথে একীভূত হয়েছে। জার্মানিতে দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী কিরচ ও ব্যাটেলস্ম্যান ১৯৯৭ সালে তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসন করে যুগ্মভাবে প্রিমিরী'র মালিকানা পরিচালনা করে। জাপানের নিউজ কর্পোরেশন তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী জাপান ব্রডকাস্টিং-এর সাথে মিলিত হয়ে একযোগে কাজ করছে।

আবার সর্ববৃহৎ নয়টি গণমাধ্যম মোড়লের মধ্যে ছয়টার সাথেই বহুজাতিক বৃহৎ দশটি হাউসের যৌথ উদ্যোগ রয়েছে। প্রায়শই বহুজাতিক গণমাধ্যম কর্পোরেশনগুলোর একে অপরের সাথে ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগগুলো স্বাচ্ছন্দে গ্রহণ করে। কেরি প্যাকারের পাবলিশিং এ্যান্ড ব্রডকাস্টিং লিমিটেড অস্ট্রেলিয়ার গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করায় রুপার্ট মারডকের নিউজ কর্পোরেশন তার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে শুরু করে। অপর নয়টি গণমাধ্যম মোড়লের সাথে নিউজ কর্পোরশনের যৌথ ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ রয়েছে।[৪০] ১৯৮৯ সালে টাইম এবং ওয়ার্নার কমিউনিকেশনস্-এর একত্রীকরণের ফলে টাইম ওয়ার্নার গড়ে ওঠে যা ১৯৯৬ সালে টার্নার ব্রডকাস্টিং অধিগ্রহণ করে। ১৯৯৮ সালেই এটা প্রায় ২৬ বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা করে এবং এর বিক্রি খুব দ্রুতই ব্যাপক আকারে বিস্তৃতি লাভ করে। ১৯৯০-এর শুরুর দিকে ১৫ শতাংশ লভ্যাংশ থেকে ১৯৯৭ সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৫ শতাংশে। টাইম ওয়ার্নারের মালিকানাধীন সিএনএন ইন্টারন্যাশনাল হলো প্রভাবশালী বৈশ্বিক টেলিভিশন সংবাদ চ্যানেল, এটি কিছু ভাষায় প্রায় দু'শটি রাষ্ট্রে সম্প্রচারিত হয়। এছাড়া তাদের এইচবিও চ্যানেলটি সাফল্যজনকভাবে পশ্চিম ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা, পূর্ব ইউরোপ এবং সমগ্র এশিয়াজুড়ে বিস্তৃত। এছাড়া ওয়ার্নার ফিল্ম স্টুডিও অস্ট্রেলিয়ান, জার্মান, ফ্রেঞ্চ এবং স্প্যানিশ কোম্পানিগুলোর সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে ইংরেজী ছাড়া অন্য ভাষাতেও যৌথ উদ্যোগের চলচ্চিত্র নির্মাণ করছে। বেশকিছু জনপ্রিয় ব্র্যান্ডিং নাম ব্যবহার করে টাইম ওয়ার্নার প্রোগ্রামিং, চ্যানেল এবং গণমাধ্যম উৎপাদিত পণ্যের কেনা-বেচা এবং লাইসেন্সিং-এর ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষমতা লাভ করে দেড়শটি ওয়ার্নার ব্র্যান্ডসহ বিভিন্ন ধরনের লাইসেন্সিং চুক্তি, পণ্য বেচা-কেনার মাধ্যমে প্রতি বছর বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার আয় করছে। একই সাথে বিশ্বব্যাপী এর পণ্যের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটছে।

ডিজনি বিশ্বব্যাপী এমন একটি বৃহৎ গণমাধ্যম ফার্ম যার সারা বিশ্বে ৫৯০টি শাখা রয়েছে। এসব শাখার মাধ্যমে ডিজনি যেমন পণ্য বিক্রয় করেছে, তেমনি বিপুলসংখ্যক উৎপাদনকারী ও বিক্রেতাকে লাইসেন্সিং সুবিধা দিচ্ছে।[৪১] ফ্রান্স, জাপান ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে ডিজনির সুসংগঠিত বিতরণ ব্যবস্থা রয়েছে। স্কান্ডিনেভিয়ান ব্রডকাস্টিং সিস্টেমস এর বৃহত্তম শেয়ার হোল্ডার ডিজনি নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক ও ফিনল্যান্ড, বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ডে বাণিজ্যিক টেরিস্টরিয়াল টিভি চ্যানেলগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে এবং এগুলোর বেশকিছুর মালিকানা রয়েছে।

ডিজনির ইএসপিএন ইন্টারন্যাশনাল বিশ্বব্যাপী ১৬৫টিরও বেশি দেশে স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতি ব্যবহার আর খেলাধুলা সম্প্রচারে নেতৃত্ব দিচ্ছে। ইএসপিএনের বাণিজ্যিক নাম ব্যবহার করে মুনাফা অর্জনের জন্য ইএসপিএন গ্রিল রেস্টুরেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

রুপার্ট মারডক অস্ট্রেলিয়াতে সংবাদপত্রের দৈনিক সার্কুলেশনের ৭০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করতেন। পরে বৃটেনে তিনিই সর্ববৃহৎ সংবাদপত্র প্রকাশক হিসেবে আবির্ভূত হন। তার ব্রিটিশ স্কাই ব্রডকাস্টিং, ইউএস ফক্স নেটওয়ার্ক বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বিস্তার করছে। ১৯৯৮ সালে মারডক দাবি করেন, তার টেলিভিশন নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় ৭৫ শতাংশের কাছে পৌঁছেছে। ল্যাটিন আমেরিকা, জাপান ও ভারতে সম্প্রচারিত স্যাটেলাইট ব্যবস্থার মাধ্যমে এটা সম্ভব হয়েছে যা তার অন্যান্য কর্মকাণ্ডকেও পূর্ণতা দিয়েছে। ব্রিটিশ স্কাই ব্রডকাস্টিং শুধু ব্রিটেনের স্যাটেলাইট টেলিভিশনের উপর আধিপত্য করছে না, বিশ্বজুড়ে সম্প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ফিল্ম ও প্রোগ্রাম উৎপাদনের সুবিধাদিও পরিচালনা করেন। তার অন্য দুটি প্রধান টেলিভিশন ব্র্যান্ড 'ফক্স চ্যানেল' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেলিভিশন নেটওয়ার্ক হলেও প্রধান চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন উৎপাদন স্টুডিও'র সাথে সম্পর্কিত। ১৯৯৩ সালে এশিয়ায় নিউজ কর্পোরেশন স্টার টেলিভিশন সার্ভিস বিক্রয় করে এশিয়ান টেলিভিশন বাজার সৃষ্টি করে। ভারতে আটটি ভিন্ন ভিন্ন নেটওয়ার্কের কোনো কোনোটিতে পঞ্চাশ শতাংশ বা শতভাগ শেয়ার রয়েছে নিউজ কর্পোরেশনের। এ সমন্বয় সামগ্রিকভাবে ভারতের অভ্যন্তরে ক্যাবল ও স্যাটেলাইট দর্শনসত্ত্বের ৪৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। চীনে নিউজ কর্পোরেশনের ছয়টি নেটওয়ার্ক রয়েছে এবং যৌথ পরিচালনায় ফোনিক্স ৩৬.২ মিলিয়ন চাইনিজ টেলিভিশন বাসিন্দাদের নিজেদের আওতাভুক্ত করেছে। তাইওয়ানে নিউজ কর্পোরেশনের সাতটি চ্যানেল রয়েছে যেগুলো বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ১৯৯৭ সালে ভারতীয় সরকার বৈদেশিক গণমাধ্যম মালিকানাসত্ত্বের ওপর কড়াকড়ি আরোপ করলে মারডক ভারতের অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের স্থানীয় নির্বাহী হিসেবে নিয়োগ দেন। চীনেও একই ঘটনা ঘটে। এভাবে নিউজ কর্পোরেশনের মতো ফার্মগুলো একত্রীকরণ এবং একীভূতকরণের মাধ্যমে সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং প্রয়োজনে ঋণের বৃহৎ পরিসরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ঝুঁকি গ্রহণ করছে। এতে তাদের মন্দা ব্যবসা কাটিয়ে ওঠা সহজ হয়ে পড়ে।[৪২]

আপাতদৃষ্টিতে এসব একচেটিয়া সমাহারগুলোর একত্রীকরণের বিষয়টি সহযোগিতামূলক মনে হলেও পরবর্তীতে শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বণ্টন বা ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যায় না। আবার একটি একচেটিয়া সমাহারের বাণিজ্যিক কৌশল অন্যটিকে নতুন কৌশলের প্রতি প্রলুব্ধ করে। এরা সাধারণত একে অন্যের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। মিডিয়া সাম্রাজ্যের প্রধান তিনটি একচেটিয়া সামাহার টাইম ওয়ার্নার, ডিজনি ও নিউজ কর্পোরেশনের মধ্যে এরূপ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। টাইম ওয়ার্নারের 'স্পোর্টস্ ইলাস্ট্রেটেড' এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে ডিজনি ইএসপিএন স্পোর্টস ম্যাগাজিনের প্রকাশ শুরু করে। সিবিএস, এনবিসি ও এবিসি'র সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েই মারডক তার ইউএস ফক্স টিভি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলেন।[৪৩] এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা গড়তে আবার নতুন একচেটিয়া সমাহারের আবির্ভাব ঘটতে পারে। এ বাস্তবতাই লেনিনের ভবিষ্যদ্বাণীকে সুস্পষ্ট করে তোলে। সাম্রাজ্যবাদীদের এ প্রতিযোগিতা তাদেরকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দিতে পারে। বিশ্বময় তাদের এ বাজার দখলের প্রবণতা পরবর্তীতে তাদের ভূ-খণ্ড দখলের দিকে অগ্রসর করে। একেই লেনিন সাম্রাজ্যবাদের সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

এ বিশ্বের রাজনৈতিক বণ্টন

লেনিন তাঁর সাম্রাজ্যবাদ তত্ত্বের সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, একচেটিয়া সমাহারগুলোর এ পৃথিবীকে পুরোপুরি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়ার প্রবণতাকে। ফিন্যান্স পুঁজি যেকোনো উপায়েই হোক এ বিশ্বের সর্ববৃহৎ পরিমাণ ভূ-খণ্ড দখল করতে চায় । এর ফলে এ বিশ্বের আধিপত্য বিস্তারকারী দেশগুলো শোষণের মাধ্যমে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করতে চায়। তাই তারা বিশ্ববাজারে একচেটিয়া অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য ট্রাস্ট, কার্টেল, কর্পোরেশন, ফিন্যান্স পুঁজির মাধ্যমে কিংবা ঋণপ্রদান বা ঋণগ্রহীতা দেশের কাছ থেকে ঋণ আদায়ের ভিত্তিতে এ কাজটি সম্পন্ন করে। লেনিন লক্ষ্য করেছেন, পুঁজিবাদী দেশগুলো এ বিশ্বের সকল অঞ্চলের ওপর এখন প্রভাব বিস্তার করেছে। আজকের যুগে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর প্রত্যক্ষভাবে উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়োজন পড়ে না, রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোকেই তারা অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে ঔপনিবেশিকতার জালে আবদ্ধ করে রাখতে পারে। বিশ্ব ফিন্যান্স পুঁজির শৃঙ্খলে বন্দী হয়ে এ নির্ভরশীলতার চক্র সৃষ্টি হয়। লেনিন তাঁর সময়কালে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তি কর্তৃক কতখানি ভূ-খণ্ড দখলে আছে–এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর নেতৃত্বে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

সাম্প্রতিক বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই সবচেয়ে আধিপত্যশীল সামরিক শক্তি। ইউরোপীয় দেশগুলো, রাশিয়া ও চীনের দ্বারা খুব একটা বাধাপ্রাপ্ত না হওয়ার কারণে এটি যেকোনো সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে তার সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করে। অন্যান্য সরকারের তুলনায় মার্কিন সরকারের সামরিক শক্তির তুলনা করে দেখা যেতে পারে। ২০০৬ সালে ইইউ২৫-ভুক্ত দেশগুলো সামরিক খাতে ৭৯,৩৯২.৭ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে যা সরকারি ব্যয়ের ১০.৮ শতাংশ, শিক্ষাখাতে ৯৫,০০৫.১ মিলিয়ন ডলার (যা সরকারি ব্যয়ের ১২.৯ শতাংশ) এবং স্বাস্থ্যখাতে ১৩৮,১৪৪.৫ মিলিয়ন ডলার (যা মোট সরকারি ব্যয়ের ১৮.৮ শতাংশ) খরচ করে। অপরদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০০৮ সালে সামরিক খাতে ৪৬৭,০৬৩ মিলিয়ন ডলার (যা মোট সরকারি ব্যয়ের ১৭.১%), শিক্ষা খাতে ৮৭,৭৩৪ মিলিয়ন ডলার (যা মোট সরকারি ব্যয়ের মাত্র ৩.২%) এবং স্বাস্থ্য খাতে ৩০৬,৫৮৫ মিলিয়ন ডলার (যা মোট সরকারি ব্যয়ের ১১.২%) খরচ করে। সুতরাং, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এর প্রভুত্ব বিস্তারকারী চরিত্রের কারণে। এর মানে এই নয় যে, এটি কখনোই ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্র বা রাশিয়া, চীনের দ্বারা সামরিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে না। বরং তাদের কথিত বিপজ্জনক গোষ্ঠী আল-কায়েদা কিংবা ইরান, উত্তর কোরিয়া বা ভেনিজুয়েলার দ্বারা সামরিক হুমকির মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা নেই।

ক্যালিনিকাস (২০০৩,২০০৫,২০০৭), হার্ভে (২০০৫, ২০০৬), প্যানিচ ও গিনডিন (২০০৪, ২০০৫) ও উড (২০০৩) তাঁদের গবেষণায় দেখিয়েছেন, আফগানিস্তান ও ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের পেছনে কারণ ছিল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য তেল সম্পদ কুক্ষিগত করা। সেইসঙ্গে পুঁজি ও পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক শক্তি বিস্তৃত করা, ইউরোপ ও চিনে তার অবস্থান শক্ত করা এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর ওপর কৌশলগত প্রভুত্ব স্থাপন করা তথা পাশ্চাত্যের আধিপত্যের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ সৃষ্টিকারী ইসলামি জাতি ও গোষ্ঠীগুলোর প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করা। এর মধ্য দিয়ে সে প্রকৃতপক্ষে বিশ্বজুড়ে নব্য-উদারবাদী পুঁজিবাদের বিস্তৃতির সংগ্রামে লিপ্ত

হয়েছে।[৪৪] তবে আফগানিস্তান ও ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, বিশ্ব সন্ত্রাসবাদ এবং ইরান, পাকিস্তান, সিরিয়া, লেবানন, ভেনিজুয়েলা বা বলিভিয়ার বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুদ্ধের হুমকি, অর্থনৈতিক প্রভাব ও ভূ-রাজনৈতিক আধিপত্য রক্ষার লড়াই বৈ অন্যকিছু নয়। এসবই হচ্ছে নব্য-সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি। যদিও বিনিয়োগ, বাণিজ্য, কেন্দ্রীভবন, বহুজাতিকীকরণ, নব্য-উদারীকরণ, কাঠামোগত সমন্বয় এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনার মতো অর্থনৈতিক কৌশল প্রয়োগ করেই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষা করা যায়। এ কাজে এখন আর সামরিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজন পড়ে না। তাহলে কেন এই সামরিক হস্তক্ষেপ? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, পৃথিবীর সব অঞ্চলই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে চায় না। এর ফলে কিছু প্রতিবন্ধকতা লক্ষ করা যায়। এ সংকট কাটিয়ে অর্থনৈতিক প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই এসব যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পুঁজি রক্ষার জন্য এ যুদ্ধযাত্রা প্রমাণ করে যে, অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তারা যুদ্ধের মতো ন-অর্থনৈতিক বিষয়কে 'উপায়' হিসেবে ব্যবহার করে সাম্রাজ্যবাদকে টিকিয়ে রাখতে চায়।[৪৫]

লেনিন তাঁর সময়কালেই অর্থনৈতিক স্বার্থকে কেন্দ্র করে সংঘাতের অনিবার্যতার দিকটি উল্লেখ করেছিলেন। আফগানিস্তান ও ইরাক যুদ্ধ যে অর্থনৈতিক স্বার্থকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় যুদ্ধ পরবর্তী বৈদেশিক বিনিয়োগের বর্ধিত হার দেখে। ২০০২ সাল থেকে আফগানিস্তানে এবং ২০০৩ সাল থেকে ইরাকে বৈদেশিক বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। ইরাকের প্রধান অর্থনৈতিক সম্পদ হচ্ছে তেল। UNCTAD[৪৬] এর তথ্যানুযায়ী, ২০০২ সালে সকল রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে ৯৯.৩ শতাংশ ছিল জ্বালানি। ২০০৬ সালে মন্দার পরেও এটি ৯৩.৯ শতাংশের মতো উচ্চ হারই রয়ে গেল। ২০০৬ সালে ২০০২ এর তুলনায় রপ্তানি মূল্যের ২.৩ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০০৩ সালে ইরাক দখলের পরে ২০০৪ সালে বৈদেশিক বিনিয়োগ ৩০০ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছে এবং ২০০৫ সালে তা বেড়ে ৫০০ মিলিয়ন ডলারকেও ছাড়িয়ে যায়। ২০০৩ সালে ইরাকে তেল রপ্তানি হয় ১০ হাজার মিলিয়ন মার্কিন ডলারের কাছাকাছি। ২০০৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৭ হাজার মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০৫ সালে তা বেড়ে ২২ হাজার মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছে এবং ২০০৬ সালে তা ২৮ হাজার মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছে। ইরাকে এ জ্বালানি রপ্তানি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তেলের আমদানি মূল্য ২.৮ গুণনীয়ক হারে বৃদ্ধি পায় এবং ব্রিটেনে তা ৩.৮ গুণনীয়ক হারে বৃদ্ধি পায়।[৪৭] তবে বিনিয়োগে সুযোগ সৃষ্টি হওয়া কিংবা সম্পদ দখলই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। এর সঙ্গে আরও একটি বিষয় জড়িয়ে আছে আর তা হলো অস্ত্র বাণিজ্য। ২০০৮ সালের ঝওচজও[৪৮]-র প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২০০৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪১টি অস্ত্র উৎপাদনকারী কোম্পানি এ বিশ্বে ৬৩ শতাংশ অস্ত্র বিক্রি করে। ১৯৯৮ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে বিশ্বের সমরাস্ত্র ৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এ তথ্য প্রমাণ করে দেয় যে, নব্য-সাম্রাজ্যবাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক আধিপত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।[৪৯] লেনিন সাম্রাজ্যবাদের যে যুদ্ধংদেহী চরিত্রের কথা বলেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আজকের দিনে তা অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে প্রকট আকারে বিদ্যমান।

যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন ইরাক ও আফগান যুদ্ধ আজকের দিনে লেনিন প্রদত্ত সাম্রাজ্যবাদের সর্বশেষ বৈশিষ্ট্যটির সবচেয়ে বড় বাস্তব প্রমাণ। ভূ-খণ্ড দখল ও বৈশ্বিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সামরিক আগ্রাসন নব্য-সাম্রাজ্যবাদের একটি পরিচিত বৈশিষ্ট্য। সেই সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, এ আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। লেনিন বলে গিয়েছিলেন, সাম্রাজ্যবাদ যতই শোষণ বৃদ্ধি করে, এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনও তত বৃদ্ধি পায়। এ প্রসঙ্গে ক্রিশ্চিয়ান ফাচ্‌স[৫০] যুক্তি দেন, ৯/১১ এর

আক্রমণ এবং বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদের বিস্তার ও বিশ্বের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাবের প্রতিক্রিয়া। এটি দুষ্ট চক্রের মতো বৈশ্বিক যুদ্ধের জন্ম দিচ্ছে। এসব যুদ্ধ একদিকে পাশ্চাত্যের প্রভাব বিস্তার ও আধিপত্য নিশ্চিত করতে চাইছে। অপরদিকে, বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ পাশ্চাত্য জীবনধারা ও নিয়ন্ত্রণকে ছিন্ন করতে চাইছে।[৫১] একথা সত্যি, বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদের পেছনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মদদ থাকলেও কিংবা এ কাজে সিআইএ ইন্ধন যোগালেও ক্ষুব্ধ মানুষের ক্ষোভকে কাজে লাগিয়েই তারা এসব ঘটনা ঘটাতে সমর্থ হচ্ছে। এসব সন্ত্রাসী হামলার অজুহাতে তারা তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিলের যুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছে আর ক্রমশ জনমনে জন্ম নিচ্ছে অসন্তোষ, তাই একদিকে লক্ষ করা যাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও শোষণ। অপরদিকে, দেখা যাচ্ছে যুদ্ধ ও শোষণবিরোধী গণআন্দোলন। এসবই লেনিন প্রদত্ত ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তব প্রতিফলনমাত্র।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. V.I. Lenin, *Imperialism, The Highest Stage of Capitalism*, in *Selected Works* (in three volumes), (Moscow: Foreign Language Publishing House, 1960), pp.707-815

২. *Ibid*. p. 782

৩. লেনিন মনে করেন, পুঁজিতান্ত্রিক একচেটিয়া প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংক ও শিল্প পুঁজির সংমিশ্রণের প্রক্রিয়াটিও বিপুল গতিতে এগিয়েছে। গুটিকয়েক মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত ও একচেটিয়া অধিকারে প্রতিষ্ঠিত মহাজনী বা ফিন্যান্স পুঁজি এখন কোম্পানি চালু করা, বাজার স্টক ছাড়া, সরকারি লোন ছাড়া প্রভৃতি থেকে বিপুল থেকে বিপুলতর মুনাফা অর্জন করছে। এই ফিন্যান্স পুঁজি তাই ফিন্যান্সিয়াল অলিগর্কি বা মহাজনী মোড়লতন্ত্রের আধিপত্যকে আরও বৃদ্ধি করছে। এই ফিন্যান্সিয়াল অলিগর্কি একটি রাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম ও সরকারের ওপরও পূর্ণাঙ্গ আধিপত্য বিস্তার করে। এভাবে সমগ্র প্রজাতন্ত্রই হয়ে ওঠে মহাজনী মোড়লতন্ত্রের করতলগত।

৪. John Atkinson Hobson, *Imperialism : A Study,* (Newyork: James Pott and company, 1902).

৫. R. Hilferding, Tr. by Morris Watnick & Gordon (edited with an introduction Tom Bottomore), *Finance Capital,* (London: Routledge & Kegan Paul, 1981).

৬. হায়দার আকবর খান রনো, *মার্কসীয় অর্থনীতি*, (ঢাকা: তরফদার প্রকাশনী, ২০০৭), দ্বিতীয় মুদ্রণ পৃ. ৫৪-৫৬

৭. Regional Conferences Latin America, Return to Contents Issue 8: Present day Imperialism, Caracas : M-L Communist Party of Ecuador (PCMLE) & Red Flag, Party of Venezuela (Bandera Roja), 1999.

৮. মাইকেল প্যারেন্টি, অনু. ওমর তারেক চৌধুরী, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, (ঢাকা : শ্রাবণ প্রকাশনী, জুলাই, ২০০৫), তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩৫-৩৬

৯. *তদেব*, পৃ. ৩৬

১০. Christian Fuchs, "New Imperialism. Information and Media Imperialism?", *Global Media and Communication,* vol.6(1), 2010, pp. 36-37

১১. *Ibid*. p.38

১২. জন বেলামি ফস্টার, "সর্বাধিক পরিমাণে তেল উৎপাদন এবং ইন্ধন সাম্রাজ্যবাদ", অনূ. ও সম্পা. ফারুক চৌধুরী, *বাজার ও বৈষম্য: মান্থলী রিভিয়ু প্রবন্ধ সংকলন*, (ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী, ২০০৯), পৃ. ৬৯-৭০

১৩. http://What-when-how.com./Social Sciences/petroleum industry social science.

১৪. জন বেলামি ফস্টার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬

১৫. *তদেব*, পৃ. ৬৫

১৬. Vladimir Ilyich Lenin, *Imperialism: the Highest Stage of Capitalism,* in Henry M. Christman, (ed.), *Essential Works Lenin,* (New York: Dover, 1917), p. 194

১৭. জোয়ান এডলম্যান স্পেরো, অনু. মমতাজউদ্দীন আহমদ, *আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের রাজনীতি*, (ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৮৪), পৃ. ৭৪-৭৫

১৮. *তদেব*, পৃ. ৯৫

১৯. *তদেব*, পৃ. ৯৯

২০. *তদেব*, পৃ. ১০৭

২১. *তদেব*, পৃ. ২৭৮

২২. মাইকেল প্যারেন্টি, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬-৩৭

২৩. জিম হাইটাওয়ার একজন মার্কিন সিন্ডিকেটেড কলামিস্ট, প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী এবং লেখক। তিনি ১৯৮৩ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত টেক্সাসের কৃষি বিভাগের একজন নির্বাচিত কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

২৪. মাইকেল প্যারেন্টি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯

২৫. হায়দার আকবর খান রনো, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২

২৬. অর্গানাইজেশন ফর ইকনোমিক কো-অপারেশন এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট।

২৭. ১৯৯৪ সালের মেক্সিকোর অর্থনৈতিক সংকট দক্ষিণ আমেরিকার অর্থনীতিতে যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল তা অনানুষ্ঠানিকভাবে 'টিকুইলা প্রভাব' নামে পরিচিত।

২৮. Christian Fuchs, *op. cit,* pp. 40-41

২৯. Regional Conferences Latin America, 1999.

৩০. হায়দার আকবর খান রনো, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২

৩১. মাইকেল প্যারেন্টি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯-৭০

৩২. *দৈনিক প্রথম আলো*, "যুক্তরাষ্ট্রে ধনীদের ওপর কর বৃদ্ধির প্রস্তাব বাতিল", ২০১২, ২২ ডিসেম্বর: পৃ. ০৯

৩৩. মাইকেল প্যারেন্টি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০-৭১

৩৪. জোয়ান এডলম্যান স্পেরো, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৪

৩৫. *তদেব*, পৃ. ১৭৭

৩৬. *তদেব*, পৃ. ১৬৯-৭০

৩৭. হায়দার আকবর খান রনো, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫

৩৮. Christian Fuchs, *op. cit,* p. 44

৩৯. হায়দার আকবর খান রনো, *মার্কসীয় অর্থনীতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫-৬৬

৪০. *তদেব*, পৃ. ৬৭

৪১. রবার্ট ম্যাকচেজনি, "গণমাধ্যম ফার্মগুলোর বাণিজ্যিক কেন্দ্রীভবন: যোগাযোগীয় অধিকারের প্রতি হুমকি"। মুসতাক আহ্‌মেদ, নূর-এ-জান্নাতুল ফেরদৌস, হুজ্জাতুল ইসলাম (অনু. ও সম্পা.), *কর্পোরেট মিডিয়ার সাংস্কৃতিক আগ্রাসন*, (ঢাকা : শ্রাবণ প্রকাশনী, ২০০৯), পৃ. ১৮-২০

৪২. *তদেব*, পৃ. ২১-২২

৪৩. *তদেব*, পৃ. ২৩-২৫

৪৪. *তদেব*, পৃ. ২৩

৪৫. Christian Fuchs, *op. cit*, pp. 50-51

৪৬. United Nations Conference on Trade and Development.

৪৭. Christian Fuchs,*op.cit*, pp. 51-52

৪৮. Stockholm International Peace Research Institution.

৪৯. Christian Fuchs, *op.cit*, pp. 52-53

৫০. ক্রিশ্চিয়ান ফাচস অস্ট্রিয়ার স্যালজবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য ও যোগাযোগ-প্রযুক্তি ও সমাজ বিষয়ক উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্রে কর্মরত আছেন। গবেষণাকর্মে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি 'ভেনিয়া ডোসেন্ডি' খেতাব অর্জন করেন। তিনি ১২০টিরও বেশি গবেষণামূলক প্রবন্ধের রচয়িতা। তাঁর উল্লেখ্যযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে *Internet and Soceity : Social Theory in the Information Age (Routledge, 2008)* I *Foundation of Critical Media and Information Studies* (Routledge, 2010).

৫১. Christian Fuchs, *op.cit*, pp. 54-55